ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের বৈশিষ্ট্য: ইতিবাচকতা

সাইয়্যেদ কুতুব

[[illegible] (worldview) : মূল আরবিতে সাইয়িদ কুতুব তাসাওউর ([illegible]) ব্যবহার করেছেন। সাধারণত তাসাওউর শব্দের অর্থ করা হয় 'concept'/'conception' বা ধারণ হিসেবে। তবে লেখক এ শব্দটিকে আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন।

তিনি ইসলামি তাসাওউর বলতে বুঝিয়েছেন কুরআন ও সুন্নাহ থেকে পাওয়া অস্তিত্বের সামগ্রিক ব্যাখ্যাকে। যে ব্যাখ্যার মধ্যে স্রষ্টা, সৃষ্টিজগৎ, মানুষের উৎস ও ভূমিকা, জীবনের উদ্দেশ্য, নৈতিকতা, সমাজ, শাসন—সবই অন্তর্ভুক্ত।

লেখক যে অর্থে তাসাওউর শব্দটি ব্যবহার করেছেন অর্থের দিক থেকে 'ধারণা', 'দৃষ্টিভঙ্গি' ইত্যাদি শব্দের তুলনায় ইংরেজি ওয়ার্ল্ডভিউ (worldview) শব্দটি তার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। দুঃখজনকভাবে ওয়ার্ল্ডভিউ শব্দের যেসব বাংলা করা হয়েছে, সেগুলো হয় অত্যন্ত অপ্রচলিত হবার কারণে অচেনা প্রায়, অথবা মূলভাব প্রকাশে ব্যর্থ কিংবা দুটোই। তাই অনুবাদে 'ওয়ার্ল্ডভিউ' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে।

সংক্ষেপে ওয়ার্ল্ডভিউ হলো :

স্রষ্টা, মহাবিশ্ব, মানুষ, ইতিহাস, জীবনমৃত্যু, জ্ঞানসহ নানা বিষয়ে মৌলিক বিশ্বাসের সমষ্টি। এটি চিন্তার ওই কাঠামো, যার সাপেক্ষে, যার মাধ্যমে এবং যার ভেতরে মানুষ বাস্তবতাকে বোঝার ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। ওয়ার্ল্ডভিউ হলো ওই লেন্স, ওই চশমা, যার ভেতর দিয়ে আমরা পৃথিবীকে দেখি। প্রত্যেকের যেমন নিজস্ব ভাষা থাকে, তেমনিভাবে প্রত্যেকের একটা ওয়ার্ল্ডভিউ থাকে। হয়তো তারা সেটাকে 'ওয়ার্ল্ডভিউ'-এর মতো গালভরা কোনো শব্দ হিসেবে চেনে না, কিন্তু শব্দের পেছনের জিনিসটা কমবেশি সবার মধ্যেই থাকে।]

> আর বলুন, 'তোমরা আমল করো। অতএব অচিরেই আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও।' (সূরা তাওবা, ৯ : ১০৫)

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য—ইতিবাচকতা। মহাবিশ্ব, প্রাণ ও মানুষের সাথে স্রষ্টার সম্পর্ক সক্রিয়। নিজ বলয়ে মানুষকেও ইতিবাচক ভূমিকা পালনের সক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অ্যারিস্টটলের দর্শনে স্রষ্টার বৈশিষ্ট্যগুলোকে তুলে ধরা হয় নেতিবাচক বক্তব্যের মাধ্যমে।[1] পারস্যের প্রাচীন ধর্ম জরাথুস্ত্রবাদের বিশ্বাসে পাওয়া যায় ডুয়ালিসম বা দুই ঈশ্বরের ধারণা। কল্যাণ এবং আলোর দেবতা আহুরা মাজদা, অন্ধকার আর মন্দের দেবতা আহরিমান। এই দুই দেবতা সমান। প্লটিনসের ঈশ্বরকে স্রষ্টাও বলা যায় না। এই স্রষ্টা দার্শনিকদের ঠিক করা যৌক্তিক আবশ্যকতা দ্বারা সীমাবদ্ধ। বনী ইসরাঈল এমন এক স্রষ্টার কথা

বলে, যিনি কেবল একটি গোত্র বা একটি জাতিকে নিয়ে চিন্তা করেন। খ্রিষ্টানরা বলে, মহান আল্লাহর বৈশিষ্ট্য তিনি ছাড়া অন্য কারও মধ্যেও মিশে থাকতে পারে; যেমনটা ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর ব্যাপারে খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন ধারা বলে থাকে। বস্তুবাদীরা আল্লাহকে পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করে।

এই ধরনের অনেক অর্থহীন চিন্তা এবং দর্শন আছে, যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আবর্জনায় পরিপূর্ণ। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ আমাদের জানায়, মহান আল্লাহ এই সবকিছুর উর্ধ্বে। ইসলামে মহান আল্লাহর বৈশিষ্ট্যগুলো নেতিবাচক নয়। সৃষ্টি এবং পরিকল্পনার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা চূড়ান্ত। তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো অনন্য, এতে আর কারও অংশীদারত্ব নেই। তিনি মানবিক যুক্তির কাঠামো দ্বারা সীমাবদ্ধ নন। তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতিপালনকারী। আল-আহাদ এবং আস-সামাদ।

তবে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের অবস্থান নিয়ে আলোচনার আগে মানবরচিত যে ধারণাগুলোকে ইসলামের বিকল্প হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, সেগুলোর অবস্থানের দিকে আমরা তাকাব—

> অ্যারিস্টটলের চিন্তায় স্রষ্টা হলো এক চিরন্তন সত্তা, যার কোনো শুরু বা শেষ নেই। স্রষ্টা পরিপূর্ণভাবে নিখুঁত। তার কোনো ইচ্ছা এবং কর্ম নেই। কর্ম সম্পাদিত হয় কোনোকিছুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা থেকে। কিন্তু স্রষ্টা তো সব ধরনের আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত। তাছাড়া 'ইচ্ছা'র অর্থ একাধিক জিনিসের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়া। কিন্তু স্রষ্টা সবচেয়ে কল্যাণময় এবং নিখুঁত। তার প্রয়োজন নেই ভালো ও মন্দ থেকে কিংবা ভালো ও উত্তমের মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নেওয়ার।
>
> অ্যারিস্টটলের মতে, একটি নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শুরু করা ঈশ্বরের জন্য মানানসই নয়। ঈশ্বর চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। এমন কিছু নেই, যা তাঁকে কর্মের জন্য প্রভাবিত করতে পারে। তার পরম সত্তার কাছে কোনোকিছুই নতুন বা পুরনো নয়। তার জন্য একমাত্র উপযুক্ত অবস্থা হলো চিরস্থায়ী প্রশান্তি ও আনন্দ। এর বাইরে আর কোনো ইচ্ছা বা অনুগ্রহ তার ক্ষেত্রে কল্পনা করা যায় না।
>
> ...স্রষ্টা যেহেতু নিখুঁত, তাই মহাবিশ্বের সৃষ্টি কিংবা এর আদি উপাদান নিয়ে তিনি ভাবেন না। বরং এই আদি উপাদান অস্তিত্বের প্রতি সংবেদনশীল। অস্তিত্বের আকাঙ্ক্ষাই আদি উপাদানকে সম্ভাবনা থেকে বাস্তবতায় আনে। মহাবিশ্বের আদি উপাদানের অস্তিত্ব ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছুরিত হয়। আকাঙ্ক্ষা প্রথমে তাকে অস্তিত্বের দিকে চালিত করে, তারপর সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় ত্রুটি থেকে পরিপূর্ণতার দিকে। কাজেই মহাবিশ্বের আদি উপাদান ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন, এমনটা বলা যায় না।[2]
>
> ইসলামের আগে পারস্যবাসী দুই দেবতায় বিশ্বাসী ছিল। এক দেবতা ছিল কল্যাণের, তার নাম আহুরা মাজদা। আলো ও কল্যাণের জগতে তার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সীমিত। অন্য দেবতার নাম আহরিমান। তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অন্ধকার আর মন্দের শক্তির ওপর। এই দুই আদিম সত্তা ছিল যমজের মতো। জোরোস্ট্রিয়ানদের একটি ধারার মতে, এই দুই দেবতা ছিল যুরবান নামে আরেক প্রাচীন দেবতার পুত্র।
>
> তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, সৃষ্টির পূর্বে আলো ও অন্ধকারের জগৎ ছিল আলাদা। একসময় আহুরা মাজদা তার নিজস্ব জগতে

কল্যাণ ও মায়ার উপাদানগুলো সৃষ্টি করতে শুরু করল। দূরের এক জগতে আহরিমান তখন ব্যস্ত তার নিজের কাজ নিয়ে। একদিন আহরিমান তার ভাইয়ের খোঁজ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। দেখল, আহুরা মাজদার জগৎ থেকে আলোর দীপ্তি বেরিয়ে আসছে। শঙ্কিত হলো আহরিমান। আলো ছড়িয়ে পড়লে যে আহরিমানের জগতের আর অস্তিত্ব থাকবে না, তার কোনো আশ্রয় থাকবে না। তাই অন্ধকারের সব বাসিন্দা, কলুষতা আর মন্দের সব অপশক্তিদের নিয়ে আহরিমান বিদ্রোহ করে বসল। ভেস্তে দিলো আহুর মাজদার সব পরিকল্পনা। মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল দুঃখ, দুর্দশা আর অনৈতিকতা। সেই থেকে চলছে আলো আর অন্ধকারের সংঘাত।[3]

তৃতীয় খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর প্রথমদিকে দার্শনিকদের ঈশ্বরের ধারণাকে প্লটিনস এতটাই 'বিশুদ্ধ' করার চেষ্টা করল যে, তা সব ধরনের বোধবুদ্ধির অগম্য হয়ে গেল। অ্যারিস্টটল মনে করত—ঈশ্বর যেহেতু নিখুঁত, তাই নিজেকে ছাড়া অন্য কোনো সত্তার ব্যাপারে তিনি সচেতন নন। অন্য কিছু নিয়ে তিনি ভাবেন না। কারণ নিম্নতর অস্তিত্ব নিয়ে ভাবা তার জন্য সমীচীন নয়। তিনি কেবল নিজ সত্তাকে উপলব্ধি করেন এবং তা নিয়েই ভাবেন। প্লটিনস আরও এগিয়ে গিয়ে দাবি করল, ঈশ্বর যেহেতু নিখুঁত এবং বিশুদ্ধ সত্তা, তাই তার পক্ষে নিজেকে জানাও অসম্ভব। ঈশ্বর নিজেকে জানারও ঊর্ধ্বে।

শেকলের প্রতিটি আংটা যেমন উৎস থেকে ক্রমাগত দূরে সরতে থাকে, তেমনিভাবে সৃষ্টির শেকলেও বিশুদ্ধ সত্তা থেকে দূরত্ব বাড়ার সাথে সাথে কমে কল্যাণ। সৃষ্টির শেকলে সর্বশেষ আংটা হলো বস্তুজগৎ। তাই ঈশ্বর ও বস্তুজগতের মাঝে বেশ কিছু অন্তর্বর্তী সত্তা থাকা আবশ্যক। প্লটিনসের মতে, পরম একক বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টি করেছে। বুদ্ধিমত্তা আত্মা সৃষ্টি করেছে। আত্মা সৃষ্টি করেছে নিম্নতর বিভিন্ন সত্তাকে। এভাবে ধাপে ধাপে বস্তুজগৎ তৈরি হয়েছে।[4]

কাজেই প্লটিনসের দর্শন অনুযায়ী পরম একক-এর একমাত্র ভূমিকা হলো বুদ্ধিমত্তাকে সৃষ্টি করা, এ ছাড়া তার আর কোনো কাজ নেই। অন্যদিকে বনী ইসরাঈল এমন এক ঈশ্বরের কথা বলে, যিনি শুধু ইয়াহূদিদেরকেই তাওহীদ অনুসরণ করতে বলেন। বনী ইসরাঈলের এই ঈশ্বরের মধ্যে মানুষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বনী ইসরাঈলকে শাস্তি দেওয়ার পর তিনি অনুতপ্ত হন। রাগ কমে এলে শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত হন। খ্রিষ্টানরা মনে করে, ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর মধ্যে মানুষ এবং স্রষ্টার প্রকৃতির মিশ্রণ ঘটেছে। চার্চের মতে, স্রষ্টার ইচ্ছা ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর সাথে সমব্যাপ্ত বা তাঁর মাঝে নিহিত। এ ধরনের সাংঘর্ষিক চিন্তা-ভাবনার ফলে তাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে বিচিত্র ধ্যানধারণা। এছাড়া বস্তুবাদীদের বিভিন্ন ধারণা নিয়ে আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করেছি, এখানে সেই আলোচনার পুনরাবৃত্তি নিস্প্রয়োজন।

এবার আসুন এই সব অস্পষ্ট, ঝাপসা ধ্যানধারণার মরুপ্রান্তর ছেড়ে বের হয়ে বিশুদ্ধ, সহজ-সরল ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের দিকে তাকানো যাক :

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ এমন এক স্রষ্টার কথা বলে যিনি চিরন্তন, চিরঞ্জীব, সার্বভৌম। তিনি সর্বজ্ঞানী, তিনি যা চান, তা-ই করেন। চূড়ান্ত কর্তৃত্ব কেবল তাঁরই। তিনি যখন চেয়েছেন, তখন মহাবিশ্ব অস্তিত্বে এসেছে। মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটেছে, ঘটছে এবং ঘটবে, সবকিছু হয় তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী। সবকিছু তাঁর ওপর নির্ভরশীল। তাঁর পবিত্র বৈশিষ্ট্যগুলোর মাধ্যমে তিনি প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রাণীর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এই মহান ও মৌলিক বাস্তবতাগুলোকে কুরআন বিস্তারিত এবং স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে।

নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি আরশের ওপর উঠেছেন। তিনি রাতকে দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। প্রত্যেকটি একে অপরকে দ্রুত অনুসরণ করে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজি, যা তাঁর নির্দেশে নিয়োজিত। জেনে রেখো, সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (চলবে) তাঁর, বরকতময় আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতিপালক। (সূরা আ'রাফ, ৭: ৫৪)

আসমান ও জমিনের কোনোকিছুই আল্লাহকে অপারগ করতে পারে না। তিনি সর্বজ্ঞ, সকল শক্তির অধিকারী। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৪৪)

বলুন, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ!, আপনি যাকে ইচ্ছা, ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা, ক্ষমতা কেড়ে নেন; যাকে ইচ্ছা, আপনি সম্মানিত করেন আর যাকে ইচ্ছা, আপনি হীন করেন। কল্যাণ আপনারই হাতে। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আপনি রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে প্রবিষ্ট করান; আপনি মৃত থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান, আবার জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটান। আর যাকে চান বিনা হিসাবে রিযক দান করেন।' (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ২৬-২৭)

তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণকারী, তিনি হলেন প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবহিত। (সূরা আনআম, ৬ : ১৮)

প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা কিছু কমে ও বাড়ে, আল্লাহ তা জানেন, প্রতিটি জিনিস তাঁর কাছে আছে পরিমাণমতো। তিনি গায়িব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী, মহান, সর্বোচ্চ। তোমাদের কেউ কথা গোপন করে বা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, সবাই তাঁর কাছে সমান। মানুষের জন্য রয়েছে সামনে ও পেছনে, একের পর এক আগমনকারী প্রহরী, যারা আল্লাহর নির্দেশে তাকে হেফাযত করে।

নিশ্চয় আল্লাহ কোনো কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আর যখন আল্লাহ কোনো জাতির মন্দ চান, তখন তা প্রতিহত করা যায় না এবং তাদের জন্য তিনি ছাড়া কোনো অভিভাবক নেই।

তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ ভীতিকর ও আশা সঞ্চারকরূপে। তিনিই উত্তোলিত করেন মেঘ, (প্রবৃদ্ধির) বৃষ্টিতে ভারাক্রান্ত। বজ্রনাদ তাঁরই ভয়ে সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করে আর ফেরেশতারাও। তিনি গর্জনকারী বজ্র প্রেরণ করেন আর তা দিয়ে যাকে ইচ্ছে আঘাত করেন, আর তারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। তিনি শক্তিতে প্রবল, শাস্তিতে কঠোর। সত্যের আহ্বান তাঁরই, আর যারা তাকে ছাড়া অন্যদেরকে ডাকে, তারা তাদের ডাকে সামান্যও সাড়া দিতে পারে না, বরং (তাদের দৃষ্টান্ত) ওই ব্যক্তির মতো, যে তার মুখে পানি পৌঁছবে ভেবে পানির দিকে হাত প্রসারিত করে দেয়, অথচ সে পানি তার মুখে কক্ষনো পৌঁছবে না। আর কাফিরদের ডাক তো শুধু ভ্রষ্টতায় পর্যবসিত হয়।

আসমানে আর জমিনে যা কিছু আছে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রতি সাজদায় অবনত হয় আর তাদের ছায়াগুলোও। বলুন, 'কে আসমানসমূহ ও জমিনের রব?' বলুন, 'আল্লাহ।' বলুন, 'তোমরা কি তাঁকে ছাড়া এমন কিছুকে

অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছ, যারা তাদের নিজেদের কোনো উপকার অথবা অপকারের মালিক নয়?' বলুন, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? নাকি অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে?' তবে কি তারা আল্লাহর এমন শরীক নির্ধারণ করেছে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের কাছে সদৃশ মনে হয়েছে? বলুন, 'আল্লাহ্ সকল বস্তুর স্রষ্টা; আর তিনি এক, মহাপ্রতাপশালী।' (সূরা রা'দ, ১৩ : ৮-১৬)

আল্লাহ আপনার কোনো ক্ষতি করতে চাইলে তিনি ছাড়া কেউ তা সরাতে পারবে না। আর তিনি যদি আপনার কল্যাণ করতে চান, তবে তিনিই তো সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। (সূরা আনআম, ৬ : ১৭)

আসমান ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহরই। যা চান, তিনি সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা-সন্তান দেন, যাকে চান পুত্র-সন্তান দেন। অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছে তাকে করে দেন বন্ধ্যা; নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাবান। (সূরা শূরা, ৪২ : ৪৯-৫০)

আল্লাহই জীবসমূহের প্রাণ হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। তারপর তিনি যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন, তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অন্যগুলো ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা করে। (সূরা যুমার ৩৯ : ৪২)

আপনি কি লক্ষ করেন না যে, আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না, যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। তারা এর চেয়ে কম হোক বা বেশি হোক, তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তারপর তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামাতের দিন তা জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত। (সূরা মুজাদিলাহ, ৫৮ : ৭)

ইসলাম স্রষ্টার সাথে বান্দার আন্তরিক সম্পর্কের কথা বলে। আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে সচেতনতাই হলো ওই ভিত্তি, যার ওপর ঈমানের কাঠামো গড়ে ওঠে। এই ভিত্তিমূলের ওপর মানুষের বিবেক শাণিত হয়, তার নৈতিকতাবোধ উন্নত হয়, গড়ে ওঠে তার আচরণের মাপকাঠি।

যে আকীদা সৃষ্টির ব্যাপারে বেখবর স্রষ্টার কথা বলে, আর যে আকীদা এমন এক স্রষ্টার কথা বলে, যার সাথে সৃষ্টির সক্রিয় ও ক্রমাগত সম্পর্ক বিদ্যমান, নিশ্চয়ই সেই দুই আকীদা সমান নয়। যে আকীদা মহান আল্লাহর ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করে মানুষের কর্মকে তার প্রকৃতির সমান্তরালে আনে, তা ওই আকীদার সমান নয়, যা স্রষ্টার ব্যাপারে নেতিবাচক অবস্থান নেয় এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে তার চরিত্রের আধ্যাত্মিক দিকগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সক্রিয় সম্পর্ক কার্যকরী এবং নেতিবাচক বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়। একটি বিশ্বাস জন্ম দেয় সুসংহত মানবিক সমাজের। আরেকটি বিশ্বাস মানুষকে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে, নিছক শারীরিক সত্তা আর উপস্থিতিতে পরিণত করে।

স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক নিয়ে বিশ্বাসই ঠিক করে দেয় মানুষ স্রষ্টাকে কতটা গুরুত্ব দেবে। যে মনে করে—স্রষ্টার কাছে তার কোনো

গুরুত্ব নেই অথবা স্রষ্টা তার ব্যাপারে জানেনই না; যেমনটা অনেক দার্শনিকরা বলে থাকে, —আর যে মনে করে—-আল্লাহ তাঁর রিয্কদাতা, আল্লাহ তাকে দেখছেন, তা ঁর দুআ শুনছেন, জবাব দিচ্ছেন এবং তার জীবনে সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন; —তাদের চিন্তা ও জীবনযাত্রায় ব্যাপক পার্থক্য থাকবে।

যে মানুষ পারস্যের জোরোস্ট্রিয়ানদের মতো দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতায় বিশ্বাস করে; অথবা যে ব্যক্তি মক্কার কুরাইশের মতো অসংখ্য দেবতায় বিশ্বাসী, তার সাথে ওই ব্যক্তির তুলনা করুন, যে শুধু এক আল্লাহয় বিশ্বাস করে। যে বিশ্বাস করে—-আল্লাহ একক, তাঁর কর্তৃত্বে কোনো শরীক নেই এবং তিনি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ভাষায় মানুষকে তাঁর বিধানসমূহ জানিয়ে দিয়েছেন। মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন কোন আচরণ তাঁকে সন্তুষ্ট করে এবং কোন কাজগুলো তাঁকে অসন্তুষ্ট করে। এই দুধরনের মানুষ সমান হতে পারে না।

গ্রীক দেবরাজ যিউসের কথা চিন্তা করুন। গ্রীকরা যিউসকে দেখত নিষ্ঠুর, হিংসুটে, খাওয়া, মদ আর যৌনতায় মগ্ন এক দেবতা হিসেবে। মানুষ কিংবা দেবতা, কাউকে নিয়ে তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। তার মনোযোগ ছিল নিজের রাজত্ব আর স্বার্থের দিকে। যখন কেউ তার কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করত অথবা তার স্বেচ্ছাচারিতায় পথে বাধা হয়ে দাঁড়াত, তখনই কেবল অন্যের প্রতি মনোযোগ দিত সে। গ্রীক পুরাণ অনুযায়ী নরকের নাম ছিল হেইডিস। মৃত মানুষের আত্মা হেইডিসে নিয়ে যাবার সময় ট্যাক্স দিতে হতো। সেই ট্যাক্স আসত যিউসের কাছে। মৃতের সংখ্যা বাড়লে যিউসের কাছে জমা হওয়া ট্যাক্সের পরিমাণও বাড়ত। চিকিৎসার দেবতা এসক্লেপিয়াস অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা করত। তার চিকিৎসায় অনেক মানুষ সুস্থ হয়ে ওঠার কারণে ট্যাক্সের পরিমাণ কমে যাচ্ছিল। যিউস তাই এসক্লেপিয়াসের ওপর ক্ষেপে গিয়েছিল।

গ্রীকদের মতে, প্রমিথিউস ছিল জ্ঞান, শিল্প ও কারিগরির দেবতা। অলিম্পাস পর্বত থেকে আগুনের আলো চুরি করে এনে মানবজাতিকে উপহার দিয়েছিল সে। মানুষকে শিখিয়েছিল কীভাবে আগুনকে কাজে লাগাতে হয়, কীভাবে জ্ঞানের শক্তিতে রুখে দাঁড়ানো যায় দেবতাদের বিরুদ্ধে। তাই যিউস প্রমিথিউসের ওপর ক্ষেপে গেল। প্রমিথিউসকে ককেশাস পর্বতের ওপর শেকলে বেঁধে রাখার নির্দেশ দিলো। সেখানে প্রতিদিন এক ঈগল পাখি ঠুকরে ঠুকরে তার কলিজা ছিঁড়ে খাবে। প্রতিরাতে সেই কলিজা আবার পূর্ণ হয়ে যাবে, পরের দিন শুরু হবে একই শাস্তি। এভাবে প্রমিথিউসের শাস্তি চলবে চিরকাল। তার পক্ষে কোনো সুপারিশ চলবে না, দেখানো হবে না কোনো করুণা।[5]

যিউস নিয়মিত তার স্ত্রীকে ধোঁকা দিত। স্ত্রী হেরার অজান্তে নিয়মিত লিপ্ত হতো বিভিন্ন মানুষ ও দেবীদের সাথে ব্যভিচারে। মেঘের দেবতাকে যিউস আদেশ দিত সূর্যকে ঢেকে দেওয়ার,+ যাতে অলিম্পাসের সিংহাসনে যিনারত তাকে দেখতে না পায় হেরা।[6]

এমন মানুষের কথা ভাবুন, যে যিউসের মতো দেবতায় বিশ্বাস করে। এমন ব্যক্তি যিউসের অনৈতিক আচরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। অন্যদিকে একজন মুসলিমের কথা ভাবুন, যে জানে আমাদের সবার গোলামি হলো মহান আল্লাহর প্রতি, যিনি উদার, পরম করুণাময়, আল-আদল। যিনি প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন। যিনি তাদেরকে ভালোবাসেন; যারা পবিত্র, যারা বিশুদ্ধ এবং যারা অনুতপ্ত হয়ে তাঁর দিকে ফেরে। ভেবে দেখুন, স্রষ্টার এবং জীবনের ব্যাপারে এই দুই ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তা কতটা আলাদা হবে।

তবে পারস্যবাসী কিংবা গ্রীকদের চেয়েও খারাপ অবস্থা হলো প্রকৃতিকে স্রষ্টা মনে করা লোকদের। প্রকৃতি মূক, বধির, অন্ধ। প্রকৃতি মানুষের কাছ থেকে কোনো বিশ্বাস দাবি করে না। মানুষ কোনো নির্দিষ্ট জীবনধারার অনুসরণ করুক, তাও চায় না প্রকৃতি। প্রকৃতি কিছুই বলে না, কিছুই চায় না, কিছুই দেখে না। প্রকৃতি পুরোপুরিভাবে মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে বেখবর। শুধু মানুষের অস্তিত্ব নয়, তার মাঝে অনুপস্থিত যেকোনো ধরনের জ্ঞান ও উপলব্ধি। প্রকৃতি এমন এক সত্তা, যার মধ্যে নৈতিকতার কোনো ধারণা নাই। প্রকৃতি কল্যাণ ও ভালো আচরণের নির্দেশ দেয় না। নিশ্চিতভাবেই এমন সত্তার পক্ষে ভালো এবং মন্দ কাজের হিসাব নেওয়া অসম্ভব।

দুজন মানুষের কথা চিন্তা করুন। একজন এই প্রকৃতিকে স্রষ্টা হিসেবে গ্রহণ করে, আরেকজন জানে মহান আল্লাহ তার স্রষ্টা। সে জানে—আল্লাহ বান্দাদের প্রয়োজনে সাড়া দেন, হিসাব গ্রহণ করেন, তিনি ন্যায়বিচারক, তিনি ক্ষমাশীল। এ দুজন মানুষের মধ্যে শুধু চিন্তা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকবে না, বরং তাদের জীবনযাত্রাও মৌলিকভাবে আলাদা হবে। এ কারণেই ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের বৈশিষ্ট্যগুলো মুসলিমের জীবনে গভীর ভূমিকা রাখে। ইসলাম মানুষের মনে চিরন্তন আল্লাহর উপস্থিতি এবং আল্লাহর সাথে সৃষ্টির সক্রিয় সম্পর্কের গভীর উপলব্ধি তৈরি করে। এ অনেক বড় এক নিয়ামাত।

মুসলিমদের প্রথম প্রজন্মের বিকাশ ঘটেছিল ওহির ছায়াতলে। যেসব ঘটনা তাদেরকে উৎকণ্ঠিত ও আতঙ্কিত করছিল, তাদের হৃদয়গুলোকে প্রকম্পিত করছিল, সেগুলো নিয়ে আলোচনা ও নির্দেশনা নিয়ে আসছিল ওহি। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এক দম্পতি এসেছিলেন সংসারজীবনের ঝগড়া আর অভিযোগ নিয়ে। এই দরিদ্র এবং আপাতভাবে বিশেষত্বহীন পরিবারের ব্যাপারে আমরা কুরআনে আলোচনা দেখতে পাই,

> আল্লাহ অবশ্যই শুনেছেন সে নারীর কথা; যে তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছেও ফরিয়াদ করছে। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শোনেন; নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা মুজাদিলাহ, ৫৮ : ১)

আমরা আরও দেখি, একজন গরিব, অন্ধ ব্যক্তি যখন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে কথা বলতে এসেছিলেন, তখন তাঁর ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআলা কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন :

> তিনি (মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ভ্রুকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। (কারণ তিনি যখন কুরাইশ সরদারদের সাথে আলোচনায় রত ছিলেন, তখন) তার কাছে এক অন্ধ ব্যক্তি এল। আর কীসে আপনাকে জানাবে যে, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো অথবা উপদেশ গ্রহণ করত;- ফলে সে উপদেশ ~~তার~~ উপকারে আসত তার। আর যে পরোয়া করে না, আপনি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার ওপর কোনো দোষ নেই। অপরদিকে যে আপনার কাছে ছুটে এল, আর সে ভয়ও করে-; আপনি তার থেকে অমনযোগী হলেন।÷ কখনো নয়, নিশ্চয় এটা উপদেশ বাণী। কাজেই যার ইচ্ছে, সে এটা স্মরণ রাখবে। (সূরা আবাসা, ৮০ : ১-১২)

ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর সময় কীভাবে মহান আল্লাহ হস্তক্ষেপ করেছেন, তার দৃষ্টান্ত আমরা দেখি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময়। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,

> যদি তোমরা তাকে (অর্থাৎ রাসূলকে) সাহায্য না করো, (তাতে কোনোই পরোয়া নেই) কারণ আল্লাহ তো তাকে সেই সময়

সাহায্য করেছেন, যখন কাফিররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল এবং তিনি ছিলেন দুজনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে[7] গুহায় ছিলেন; তিনি তখন তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন, 'বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ তো আমাদের সাথে আছেন।' তখন আল্লাহ তার প্রতি তাঁর প্রশান্তি বর্ষণ করলেন আর তাকে এমন সেনাবাহিনী দিয়ে শক্তিশালী করলেন, তোমরা যা দেখতে পাওনি। আর তিনি কাফিরদের (মুখের) বুলিকে গভীর নিচে ফেলে দিলেন। আর আল্লাহর বাণীই সুউচ্চ। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। (সূরা তাওবা, ৯ : ৪০)

আমরা দৃষ্টান্ত দেখি বদরের যুদ্ধের সময়; যেমন আল্লাহ উল্লেখ করেছেন,

...আপনার রব আপনাকে যথাযথভাবে আপনার ঘর থেকে বের করেছিলেন, অথচ মুমিনদের এক দল তো তা অপছন্দ করছিল। সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তারা আপনার সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিল। মনে হচ্ছিল তাদেরকে যেন মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর তারা যেন তা অবলোকন করছে। আর স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দু দলের একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে; আর তোমরা কামনা করছিলে যে, অস্ত্রহীন দলটি তোমাদের জন্য হবে এবং আল্লাহ চাচ্ছিলেন যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং কাফিরদেরকে নির্মূল করবেন। যাতে তিনি সত্যকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন আর মিথ্যেকে মিথ্যে প্রমাণিত করেন, যদিও পাপীরা তা অপছন্দ করে। আর স্মরণ করো, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট ফরিয়াদ করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যে, 'অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে, যারা একের পর এক আসবে।' আর আল্লাহ এটা করেছেন শুধু সুসংবাদ স্বরূপ এবং যাতে তোমাদের অন্তরসমূহ এর দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে; আর সাহায্য তো শুধু আল্লাহর কাছ থেকেই আসে; নিশ্চয় আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। স্মরণ করো, যখন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে স্বস্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যাতে এর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করেন আর তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করেন, তোমাদের হৃদয়সমূহ দৃঢ় রাখেন এবং এর মাধ্যমে তোমাদের পা-সমূহ স্থির রাখেন। স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফেরেশতাদের প্রতি ওহি প্রেরণ করেন যে, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি; সুতরাং তোমরা মুমিনদেরকে অবিচল রাখো।' যারা কুফরি করেছে অচিরেই আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব; কাজেই তোমরা আঘাত করো তাদের ঘাড়ের ওপরে এবং আঘাত করো তাদের প্রত্যেক আঙুলের অগ্রভাগে এবং জোড়ে। (সূরা আনফাল, ৮ : ৫-১২)

উহুদের যুদ্ধের সময়ও আমরা এর দৃষ্টান্ত দেখতে পাই,

অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন, যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, অতঃপর যখন তোমরা নিজেরাই (পার্থিব লাভের বশে) দুর্বল হয়ে গেলে এবং (নেতার) হুকুম সম্বন্ধে মতভেদ করলে এবং তোমাদেরকে তোমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু দেখানোর পর তোমরা অবাধ্য হলে, তোমাদের কেউ কেউ দুনিয়ার প্রত্যাশী হলে এবং কেউ কেউ পরকাল চাইলে, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে শত্রুদের হতে ফিরিয়ে দিলেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ মুমিনদের ওপর অনুগ্রহশীল। স্মরণ করো, তোমরা যখন ওপরের (পাহাড়ের) দিকে ছুটছিলে এবং পেছন ফিরে কারও প্রতি লক্ষ করছিলে না, আর রাসূল

তোমাদেরকে পেছন দিক থেকে ডাকছিলেন। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্টের ওপর কষ্ট প্রদান করলেন, যাতে তোমরা যা হারিয়েছ অথবা তোমাদের ওপর যে বিপদ এসেছে, (তার কারণ উপলব্ধি করার পর ভবিষ্যতে) তার জন্য দুঃখিত না হও, বস্তুত তোমরা যা-ই করো, আল্লাহ সে ব্যাপারে বিশেষভাবে অবহিত। তারপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন তন্দ্রারূপে প্রশান্তি, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল এবং একদল জাহিলি যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করে নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল এই বলে যে, 'আমাদের কি কোনোকিছু করার আছে?' বলুন, 'সব বিষয় আল্লাহরই এখতিয়ারে।' যা তারা আপনার কাছে প্রকাশ করে না, তারা তাদের অন্তরে সেগুলো গোপন রাখে। তারা বলে, 'এ ব্যাপারে আমাদের কোনোকিছু করার থাকলে আমরা এখানে নিহত হতাম না।' বলুন, 'যদি তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করতে, তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল, তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বের হতো। এটা এজন্য যে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা আছে, তা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের মনে যা আছে, তা পরিশোধন করেন। আর অন্তরে যা আছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ বিশেষভাবে অবগত। (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৫২-১৫৪)

প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদের জীবনের ঘটনাপ্রবাহে মহান আল্লাহর আসমানি হস্তক্ষেপের স্পষ্ট নিদর্শন আমরা দেখতে পাই। আসমানি এই সাহায্য শুধু প্রথম প্রজন্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতিতে এটাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পদ্ধতি;; আমরা তা উপলব্ধি করি বা না করি। আল্লাহর রাসূলদের জীবনীতেও এমন অনেক উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। এমন অনেক ঘটনার বর্ণনা কুরআনে মহান আল্লাহ দিয়েছেন। ফিরআউন এবং তার রাজপরিষদের সাথে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর মুখোমুখি হবার ঘটনা থেকে এমন একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেছেন,

আমরা আপনার কাছে মূসা ও ফিরআউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। নিশ্চয় ফিরআউন জমিনের বুকে অহংকারী হয়েছিল, আর সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণিকে দুর্বল করে রেখেছিল, তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত থাকতে দিত। সে তো ছিল ফাসাদ সৃষ্টিকারী। সে দেশে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার ইচ্ছে করলাম, আর তাদেরকে নেতা ও উত্তরাধিকারী করার (ইচ্ছে করলাম)। আর (ইচ্ছে করলাম) জমিনে তাদেরকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে এবং ফিরআউন, হামান ও তাদের সৈন্যদেরকে দেখিয়ে দিতে, যা তারা তাদের কাছ থেকে আশঙ্কা করছিল।

আর আমি মূসার মায়ের প্রতি নির্দেশ পাঠালাম, 'তুমি তাকে দুধ পান করাও। অতঃপর যখন তুমি তার ব্যাপারে আশঙ্কা করবে, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করবে। আর তুমি ভয় করবে না এবং চিন্তা করবে না। নিশ্চয় আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করব।'

তারপর ফিরআউনের লোকজন তাকে কুড়িয়ে নিল। এর পরিণাম তো এ ছিল যে, সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবে। নিঃসন্দেহে ফিরআউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী। ফিরআউনের স্ত্রী বলল, 'এ শিশুটি আমার ও তোমার চক্ষু শীতলকারী, তাকে হত্যা করো না। সে আমাদের উপকারে লাগতে পারে অথবা তাকে আমরা পুত্র হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে ওরা উপলব্ধি করতে পারেনি (তাদের এ কাজের পরিণাম কী)। আর মূসার মায়ের অন্তর বিচলিত হয়ে উঠেছিল। যাতে সে আস্থাশীল হয় সে জন্য আমরা তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিলে সে তার পরিচয় তো প্রকাশ করেই

দিত। মূসার মা মূসার বোনকে বলল, ‘তার পেছনে পেছনে যাও।’ সে দূর থেকে তাকে দেখছিল, কিন্তু তারা টের পায়নি। আর পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রী-স্তন্যপানে তাকে বিরত রেখেছিলাম।

অতঃপর মূসার বোন বলল, ‘তোমাদেরকে কি আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দেবো, যারা তোমাদের হয়ে একে লালন-পালন করবে এবং এর মঙ্গলকামী হবে?’ এভাবে আমি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে আনলাম যাতে তার চোখ জুড়ায়, সে দুঃখ না করে আর জানতে পারে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৩-১৩)

একই ধরনের ঘটনা আমরা দেখি নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর ক্ষেত্রে,

এদের আগে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যারোপ করেছিল—সুতরাং তারা আমাদের বান্দার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল আর বলেছিল, ‘পাগল’, আর তাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। তখন তিনি তাঁর রবকে আহ্বান করে বলেছিলেন, ‘নিশ্চয় আমি অসহায়, অতএব আপনি প্রতিবিধান করুন।’ ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বারসমূহ প্রবল বর্ষণশীল বারিধারার মাধ্যমে এবং মাটি থেকে উৎসারিত করলাম ঝরনাসমূহ; ফলে সমস্ত পানি মিলিত হলো এক নির্ধারিত নির্দেশনা অনুসারে। আর আমি নূহকে আরোহণ করালাম কাঠ ও পেরেক নির্মিত নৌযানে,+ যা চলত আমাদের চোখের সামনে; তাঁর জন্য পুরস্কারস্বরূপ, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। (সূরা ক্বামার, ৫৪ : ৯-১৪)

ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর ক্ষেত্রেও একই ধরনের দৃষ্টান্ত দেখা যায়,

তারা বলল, ‘তাকে আগুনে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের দেবদেবীদেরকে সাহায্য করো, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।’ আমি বললাম, ‘হে আগুন!- তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।’ তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু আমি তাদেরকেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম। আর আমি তাকে ও (তার ভ্রাতুষ্পুত্র) লূতকে উদ্ধার করে তাদেরকে এমন দেশে নিয়ে গেলাম, যা আমি বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণময় করেছি। এবং আমি ইবরাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক আর অতিরিক্ত পুরস্কারস্বস্রূপ ইয়া’কূবকে এবং প্রত্যেককেই করেছিলাম সৎকর্মপরায়ণ। আর তাদেরকে আমি নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সঠিক পথ দেখাত। আমি তাদের প্রতি সৎকাজ করার, সালাত কায়েম করার এবং যাকাত প্রদান করার জন্য ওহি প্রেরণ করেছিলাম। আর তারা আমারই ইবাদাত করত। (সূরা আম্বিয়া, ২১ : ৬৮-৭৩)

আমরা মহান আল্লাহর ক্রিয়া দেখি জীব ও জড়জগতে, সমগ্র মহাবিশ্বে,

নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনকে ধারণ করেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়। আর যদি তারা স্থানচ্যুত হয়, তাহলে তিনি ছাড়া আর কে আছে, যে এগুলোকে ধরে রাখবে? নিশ্চয় তিনি পরম সহনশীল, অসীম ক্ষমাপরায়ণ। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৪১)

তারা কি আকাশে (উড়ন্ত অবস্থায়) নিয়োজিত পাখিগুলোর দিকে তাকায় না? আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই সেগুলোকে ধরে রাখেন না। নিশ্চয় এতে এমন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা ঈমান আনে। (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ৭৯)

আর এমন কত জীবজন্তু রয়েছে, যারা নিজদের খাদ্য মজুদ রাখে না, আল্লাহই তাদেরকে রিয্‌ক দান করেন আর তোমাদেরকেও। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা, আনকাবূত, ২৯ : ৬০)

তোমরা যে বীজ বপন করো, সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা তা অঙ্কুরিত করো, না আমি অঙ্কুরিত করি? আমি চাইলে তা খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা পরিতাপ করতে থাকবে, (আর বলবে যে) 'আমরা তো দায়গ্রস্ত হয়ে পড়লাম, বরং আমরা হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়েছি।'

তোমরা যে পানি পান করো সে ব্যাপারে আমাকে বলো। বৃষ্টিভরা মেঘ থেকে তোমরা কি তা বর্ষণ করো, না আমি বৃষ্টি বর্ষণকারী? আমি ইচ্ছে করলে তাকে লবণাক্ত করে দিতে পারি, তাহলে কেন তোমরা শোকর আদায় করো না?

তোমরা যে আগুন প্রজ্বলিত করো সে ব্যাপারে আমাকে বলো, তোমরাই কি এর (লাকড়ির গাছ) উৎপাদন করো, না আমি করি? আমি তাকে (অর্থাৎ আগুনকে) করেছি স্মারক আর মরুর অধিবাসীদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু। কাজেই (হে নবি;!) আপনি আপনার মহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। (সূরা ওয়াকিআ, ৫৬ : ৫৩-৭৪)

তারা কি দেখে না যে, আমরা এ জমিনকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে আনছি? আর আল্লাহই হুকুম করেন এবং তাঁর হুকুম প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই এবং তিনিই দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা রা'দ, ১৩ : ৪১)

সৃষ্টির সাথে মহান আল্লাহর এই সক্রিয় এবং ইতিবাচক সম্পর্কের বর্ণনা পাওয়া যায় কুরআনের পাতায় পাতায়। সৃষ্টির সাথে মহান আল্লাহর এই সম্পর্কের মাধ্যমে একত্ব বা তাওহীদের শিক্ষা প্রকাশ পায়। তাওহীদের শিক্ষা ইতিবাচক ও সক্রিয়তার শিক্ষা। ইসলামি আকীদা আমাদের শেখায়, মহান আল্লাহ সক্রিয়। সৃষ্টিজগতের সবকিছু তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী হয় এবং সৃষ্টিজগৎ তাঁর ওপর নির্ভরশীল। দার্শনিকদের খোদার মতো তিনি নিষ্ক্রিয়, আত্মকেন্দ্রিক নন।

ইসলামের প্রথম প্রজন্ম; সাহাবিগণ এই বাস্তবতাকে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন। পেরেছিলেন বলেই তাঁরা পরিণত হয়েছিলেন মানব ইতিহাসে সবচেয়ে অনন্য, সবচেয়ে সফল প্রজন্মতে। সকাল থেকে সন্ধ্যা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা মহান আল্লাহর উপস্থিতি ও কর্তৃত্বের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। মহান আল্লাহর রহমতের ছায়ায় তাঁরা বসবাস করতেন। তাঁরা দেখতেন, কীভাবে তাদের জীবনের ছোট-বড় নানা ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ হস্তক্ষেপ করছেন। কীভাবে তিনি তাদের সাহায্য করছেন, ভুলগুলো মুছে দিচ্ছেন, চালিত করছেন সঠিক দিকে। এই উপলব্ধি তাদেরকে সতর্ক করেছিল, প্রশান্তও করেছিল। এই উপলব্ধি তাদরকে করেছিল জাগ্রত ও সক্রিয়। একই সাথে মহান আল্লাহর ওপর তাঁদের নির্ভরশীল করেছিল। এই জ্ঞান তাঁদেরকে করেছিল আল্লাহর সামনে বিনীত এবং মানুষের সামনে সম্মানিত। এই উপলব্ধি তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল আল্লাহর শত্রুদের পরাজিত করার অদম্য এক আকাঙ্ক্ষা, যার কোনো তুলনা মানব ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আর এই মানুষগুলোর মাধ্যমেই আল্লাহ পৃথিবীতে মহান সংস্কার ও পরিবর্তন এনেছেন। আগের সব আবর্জনাকে ধুয়েমুছে মানবজাতিকে তাঁরা নিয়ে গেছেন অতুলনীয় উচ্চতায়।

আগেই বলেছি, মহাবিশ্বে মানুষকে;- বিশেষ করে মুমিনকে গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। এই ভূভুমিকা বাস্তবায়নের জন্য ইসলামের শিক্ষা প্রয়োগ করতে হবে। মনের ভেতরে লুকিয়ে রাখার জন্য ইসলামের শিক্ষা নাযিল হয়নি, এই শিক্ষা এসেছে কাজে রূপান্তরিত হবার জন্য। একজন মুমিন ঈমানকে শুধু অন্তরে লুকিয়ে রেখে সন্তুষ্ট হতে পারে না। মুমিন জানে, সে এক সক্রিয় শক্তি। তার ঈমানকে সে পরিবর্তনের কার্যকরী শক্তিতে পরিণত করে, এটিও ইসলামের ইতিবাচকতার একটি প্রকাশ।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ কোনো তত্ত্ব, মতাদর্শ বা ইউটোপিয়া নয়। ইসলাম কোনো আধ্যাত্মিক রহস্যবাদ নয়, যা নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষের অন্তরে আগাছার মতো পড়ে থাকে। তাত্ত্বিক বা অ্যাকাডেমিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউকে তৈরি করা হয়নি। এটি একটি বাস্তবসম্মত প্রায়োগিক পরিকল্পনা, যা পৃথিবীকে কল্যাণের দিকে পরিবর্তন করতে চায়। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ মুসলিমের হৃদয়ে জীবন্ত থেকে তাকে ক্রমাগত চালিত করতে থাকে পৃথিবীতে তার দায়িত্ব ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য। হৃদয়ের গভীর থেকে মুমিনকে কাজের দিকে ঠেলতে থাকে। তাকে গঠনমূলক কাজের দিকে চালিত করে,+ যেন বিশ্বাসের পুরো শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমাজকে সে পুনর্গঠন করতে পারে এবং মানুষের জীবনে বাস্তবায়িত হতে পারে ইসলামের বিশ্বাস। ইসলাম তাঁর অনুসারীদের কাছ থেকে কাজ দাবি করে। বারবার তাকে বলতে থাকে, 'উঠে দাঁড়াও! বের হও।! তোমার কাজের মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করো ইসলামের শিক্ষা।'

কুরআনে যখনই বিশ্বাস ও বিশ্বাসীদের কথা এসেছে, ঠিক একইসাথে কাজের মাধ্যমে বিশ্বাসকে বাস্তবে পরিণত করার কথাও এসেছে। কারণ ঈমান নিছক অন্তরের কোনো অনুভূতি নয়। ঈমান হলো এমন এক শক্তি, যা কর্মে পরিণত হয়।

> তারাই তো মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি এবং তাদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারাই সত্যনিষ্ঠ। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৫)
>
> তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে জমিনে খিলাফাত দান করবেন যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে তিনি খিলাফাত দান করেছিলেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতিপূর্ণ অবস্থাকে পরিবর্তিত করে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোনোকিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরি করবে, তারাই ফাসিক। (সূরা নূর, ২৪ : ৫৫)
>
> তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানবজাতির (সর্বাত্মক কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভূত করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দেবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে... (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১১০)
>
> তখন তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে পুরুষ হোক কিংবা নারীই হোক, নিশ্চয় আমি তোমাদের কোনো আমলকারীর আমল নষ্ট করব না। তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করবে এবং স্বীয় গৃহ হতে বিতাড়িত হবে ও আমার পথে নির্যাতিত হবে, যুদ্ধ করবে ও নিহত হবে, নিশ্চয় আমি তাদের গুনাহসমূহ দূর করে দেবো এবং নিশ্চয়ই তাদেরকে এমন জান্নাতে দাখিল করব, যার নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদনদী, আল্লাহর নিকট হতে

> পুরস্কার হিসেবে, বস্তুত আল্লাহর নিকটেই উত্তম বিনিময়। (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৯৫)
>
> কালের শপথ! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে (ডুবে) আছে, তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে। (সূরা আসর, ১০৩ : ১-৩)

ঈমান কেবল অন্তরের অনুভূতি কিংবা মস্তিষ্কে গুছিয়ে রাখা ধ্যানধারণা নয়, যার কোনো প্রয়োগ নেই বাস্তবে। বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন, উপাসনালয়ে সীমাবদ্ধ নির্দিষ্ট কিছু ভক্তিমূলক আচার-অনুষ্ঠানের নাম ইসলাম নয়। ইসলাম সমাজ ও শাসনের ক্ষেত্রে সক্রিয়। ইসলাম মহান আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করতে চায় সবক্ষেত্রে।[8]

নিজের জীবন, সম্পদ এবং কাজের মাধ্যমে ইসলামের সত্যতার পরিপূর্ণ সাক্ষ্য দেওয়ার আগ পর্যন্ত ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউতে উদ্‌বুদ্ধ মুসলিমের বিবেক সন্তুষ্ট হতে পারে না। তার মনে অতৃপ্তি থেকে যাবে, সে বিশ্রাম নিতে পারবে না। মুসলিম হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়ে মহান আল্লাহ তাকে যে মহান নিয়ামাত দিয়েছেন, সেই নিয়ামাতের শুকরিয়া আদায় করতে পেরেছে বলে তার কাছে মনে হবে না। দ্বীন ইসলামের জন্য শ্রম, সাধনা এবং কুরবানি ছাড়া নিজেকে সে আখিরাতের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবার উপযোগী মনে করতে পারবে না।

> আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মাত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের ওপর সাক্ষী হও এবং রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের ওপর...(সূরা বাকারা, ২ : ১৪৩)
>
> ...তার চেয়ে বড় জালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর কাছ থেকে তার কাছে আগত সাক্ষ্যকে গোপন করে? (সূরা বাকারা, ২ : ১৪০)

এই সাক্ষ্যের প্রথম প্রকাশ ঘটে ব্যক্তির নিজের ভেতর। একজন মুসলিমকে অবশ্যই তার ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি দিক সাজাতে হবে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ ও আকীদা অনুযায়ী। প্রতিটি মুহূর্ত দ্বীনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, যাতে করে কেবল অন্তর কিংবা মুখের উচ্চারণের মাধ্যমে নয়, বরং আমলের মাধ্যমেও সে ঈমানের সাক্ষ্য দিতে পারে। মুসলিমের দায়িত্ব হলো—ঈমানের জীবিত উদাহরণ ও প্রতিনিধিতে পরিণত হওয়া।

ঈমানের সাক্ষ্য দেওয়ার আরেকটি দিক হলো—ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউকে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে অন্যদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা। এই আহ্বানের পেছনে বিভিন্ন উদ্দেশ্য আছে। প্রথম উদ্দেশ্য, ঈমানের নিয়ামাতের জন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ শেখায় পুরো মানবজাতি; বনী আদম ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। আমরা আমাদের ভাইদের কল্যাণকামী। এ কল্যাণকামিতা আমাদের উদ্‌বুদ্ধ করে তাদেরকে ওই সত্য সম্পর্কে জানাতে, যে সত্য আমাদেরকে চালিত করে। এই সত্য কেবল আমাদের পরিবার, গোত্র, জাতিগোষ্ঠী কিংবা বর্ণের জন্য আসেনি। এ সত্য এসেছে সমগ্র মানবজাতির জন্য, সমগ্র সৃষ্টির জন্য।

ঈমানের সাক্ষ্য দেওয়ার আরেকটি কারণ হলো—এটি মুসলিমদের বিশেষ একটি দায়িত্ব। আগে মানবজাতির অজ্ঞতা এবং ভুলগুলো

সংশোধন করার দায়িত্ব ছিল আল্লাহর নবি ও রাসূলদের (আলাইহিমুস সালাম)। কিন্তু মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেহেতু শেষ নবি, তাই এই দায়িত্ব এখন তাঁর উম্মাহর। আমরা মুসলিমরা নবিদের উত্তরাধিকারী। যে মহান দায়িত্ব তাঁরা বহন করেছেন, সেটি এখন আমাদের কাঁধে। এই দায়িত্বের অনুভূতি মুসলিমদের চালিত করে পুরো মানবজাতির সামনে সত্যকে তুলে ধরতে। আমরা যদি মানবজাতির সামনে ইসলামের সত্য তুলে ধরার দায়িত্ব পালন না করি, তাহলে মানবজাতির বিচ্যুতির জন্য আমাদের দায়ী থাকতে হবে।

> রাসূলগণ ছিলেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী, যাতে রাসূলদের আগমনের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোনো অজুহাত অভিযোগের সুযোগ না থাকে। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা, ৪ : ১৬৫)
>
> আর রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি আযাব দিই না। (সূরা ইসরা, ১৭ : ১৫)

আল্লাহর নির্দেশিত জীবনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং মানবজীবনের সব দিক ইসলামি ব্যবস্থা অনুযায়ী সাজানোর চেষ্টার মাধ্যমে একজন মানুষ তার ঈমানের সাক্ষ্য দেয়। ইসলাম বলে, সার্বভৌম কর্তৃত্ব কেবল আল্লাহর। কাজেই ইসলামের শিক্ষাকে পরিপূর্ণভাবে ধারণ করার জন্য এমন এক সমাজ দরকার, যে সমাজ মহান আল্লাহকে একক সার্বভৌম সত্তা হিসেবে স্বীকার করে এবং এই মৌলিক নীতির আলোকে জীবন সাজায়। মুসলিমরা যখন এই সামষ্টিক প্রচেষ্টায় নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে, তখনই এবং কেবল তখনই মুসলিমরা আল্লাহর প্রতিশ্রুত সাহায্য পাবার যোগ্য হয়ে ওঠে। এটি এমন এক শর্ত, যাতে নেই কোনো ধরনের অস্পষ্টতা।

> ... নিশ্চয় আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন, যে আল্লাহকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। তারা এমন লোক, যাদেরকে আমরা জমিনের বুকে প্রতিষ্ঠিত করলে সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর সব কাজের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর এখতিয়ারে। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৪০-৪১)

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ মানুষকে ইতিবাচক এবং সক্রিয় হতে উদ্‌বুদ্ধ করে। মানুষ পরিবর্তনের সক্রিয় শক্তি, নিষ্ক্রিয় দর্শক নয়। মানুষ পৃথিবীতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে খলীফা। পৃথিবীতে আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থা বাস্তবায়নের দায়িত্ব মানুষের। এজন্য তাঁকে উদ্যোগ নিতে হবে, গড়তে হবে, বদলাতে হবে। সৃষ্টির নিয়মগুলো কাজে লাগিয়ে জমিনে নিয়ে আসতে হবে বিকাশ ও ইতিবাচক পরিবর্তন।

> তিনিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন। তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা থেকে জন্মায় উদ্ভিদ, যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাকো। তার মাধ্যমে তিনি তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেন ফসল, যাইতুন, খেজুর গাছ, আঙুর এবং সকল ফল-ফলাদি। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। আর তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত, দিন, সূর্য ও চাঁদকে এবং নক্ষত্ররাজিও তাঁরই নির্দেশে নিয়োজিত। নিশ্চয় এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে অনেক নিদর্শন। আর তিনি তোমাদের জন্য জমিনে বিভিন্ন রঙের বস্তুরাজি সৃষ্টি করেছেন। এতে ওই সমস্ত লোকেদের জন্য নিশ্চিতভাবে নিদর্শন আছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায়। তিনিই সমুদ্রকে কল্যাণে নিয়োজিত

রেখেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা (মাছের) গোশত খেতে পারো, আর তা থেকে তোমরা রত্নরাজি সংগ্রহ করতে পারো, যা তোমরা অলংকার হিসেবে পরিধান করো। আর নৌযানগুলোকে তোমরা দেখতে পাও ঢেউয়ের বুক চিরে তাতে চলাচল করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করতে পারো আর শোকর আদায় করতে পারো। আর জমিনে তিনি স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা, যাতে জমিন তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করেছেন নদনদী ও পথসমূহ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারো। আর দিক-দিশা প্রদানকারী চিহ্নসমূহ; আর তারকারাজির সাহায্যেও তারা পথনির্দেশ লাভ করে। কাজেই যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার মতো, যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ১০-১৭)

আমি বললাম, 'তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট কোনো হিদায়াত আসবে, তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।' আর যারা কুফরি করবে ও আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করবে, তারাই জাহান্নামি; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (সূরা বাকারা, ২ : ৩৮-৩৯)

পৃথিবীতে খলীফার দায়িত্ব পালনে মহান আল্লাহ মুসলিমদের সাহায্য করবেন—এই বোধ সবসময় একজন মুসলিমের মধ্যে কাজ করবে। এই বোধ তাঁর মধ্যে এই সচেতনতাও তৈরি করে যে, মহাবিশ্বের সাথে মানুষের সম্পর্ক কিংবা তাকদীরের সাথে মানুষের সম্পর্কে নেতিবাচকতা ও নিষ্ক্রিয়তার কোনো জায়গা নেই। মানুষকে বিভিন্ন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তাকে সাহায্য করার জন্য আছে প্রকৃতির বিধানগুলো। সব সৃষ্টি করা হয়েছে এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য, কোনোকিছুই অর্থহীনভাবে তৈরি হয়নি। ব্যক্তির মন থেকে নেতিবাচক মনোভাব দূর হলে সে কাজের দিকে চালিত হয়। তবে ইসলাম শুধু নেতিবাচক মনোভাব সরায় না, বরং ইতিবাচক মনোভাবকেও করে শক্তিশালী। ইসলাম আমাদের শেখায় জীবনের তাকদীর কার্যকর হয় মানুষের সিদ্ধান্ত এবং কাজের মাধ্যমে। এই শিক্ষা মানুষকে সক্রিয় করে। আল্লাহ বলেছেন,

...নিশ্চয় আল্লাহ কোনো কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে...(সূরা রা'দ, ১৩ : ১১)

তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে আযাব দেবেন এবং তাদেরকে অপদস্থ করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং মুমিন কওমের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত করবেন। আর তাদের অন্তরসমূহের ক্রোধ দূর করবেন এবং আল্লাহ যাকে চান, তার তাওবা কবুল করেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবা, ৯ : ১৪-১৫)

মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে আর যারা নগরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে আমরা অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রবল করব; এরপর এ নগরীতে আপনার প্রতিবেশীরূপে তারা স্বল্প সময়ই থাকবে... (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬০)

> আর আল্লাহ যদি মানুষের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ সৃষ্টিকুলের প্রতি অনুগ্রহশীল। (সূরা বাকারা, ২ : ২৫১)

> মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে ও স্থলে ফাসাদ প্রকাশ পায়। ফলে আল্লাহ তাদের কতিপয় কৃতকর্মের স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে। (সূরা রূম, ৩০ : ৪১)

নিছক কথা কিংবা মাথার ভেতরে চিন্তা দিয়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা যায় না। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে হলে বিশ্বাসকে কাজে পরিণত করতে হবে। আমাদের সব কাজের হিসেব নেওয়া হবে, দেওয়া হবে উপযুক্ত প্রতিদান। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যায়, তিনি তাদের পথ দেখান, সাহায্য করেন।

> আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন। (সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৬৯)

> তোমরা কি মনে করো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কে ধৈর্যশীল তা এখনো প্রকাশ করেননি? (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৪২)

> -আর বলুন, 'তোমরা আমল করো। অতএব অচিরেই আল্লাহ তোমাদের আমল দেখবেন, তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও। আর অচিরেই তোমাদেরকে দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতার দিকে ফিরিয়ে আনা হবে, অতঃপর তিনি তোমরা যা করতে, তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন।' (সূরা তাওবা, ৯ : ১০৫)

একজন মুসলিম যখন এই সবগুলো দিক চিন্তা করে, তখন সে বুঝতে পারে—পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব কোনো অপরিকল্পিত দুর্ঘটনা নয়। এই পৃথিবীতে তাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যসহ পাঠানো হয়েছে। তাঁর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে এক নির্দিষ্ট পথ। পৃথিবী তার কর্মক্ষেত্র। স্থান-কালের এই মহাবিশ্বে তার প্রতিটি কাজের হিসেব রাখা হচ্ছে। মহান আল্লাহর খলীফার ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করা ছাড়া মানুষ আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার কিংবা আখিরাতের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবার আশা করতে পারে না। মানুষকে নিজের জীবনে এবং অন্যদের জীবনে আল্লাহর নির্দেশনার বাস্তবায়ন করতে হবে। যে জীবনব্যবস্থাকে মহান আল্লাহ প্রত্যেক জাতি, সম্প্রদায় ও ব্যক্তির জন্য আবশ্যক করেছেন, সেই ইসলামি ব্যবস্থা প্রয়োগ না করার কারণে পৃথিবীতে দেখা দেওয়া কলুষতাকে উপড়ে ফেলার জন্য সংগ্রাম করতে হবে তাকে। পৃথিবীতে কলুষতা বাড়তে থাকলে অবশ্যই এর দায়ভার কিছুটা হলেও মুমিনের ওপর এসে পড়বে। কারণ সে তার কাজের মাধ্যমে পুরো পৃথিবীর সামনে মহান আল্লাহর একত্ব এবং চূড়ান্ত কর্তৃত্বের সাক্ষ্য দেয়নি, আল্লাহর নির্ধারিত জীবনব্যবস্থা বাস্তবায়নের যথেষ্ট চেষ্টা করেনি।

একজন মুসলিম যখন এভাবে চিন্তা করে, তখন নিজের ব্যাপারে তার ধারণায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। দায়িত্ব অনুযায়ী তার কাজের স্পৃহা বাড়ে। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে নিজেকে সে সঁপে দেয় পুরোপুরিভাবে। নিজেকে সে প্রস্তুত করতে থাকে মহান আল্লাহর মুখোমুখি হবার সেই প্রতীক্ষিত মুহূর্তের জন্য।

[1] অ্যারিস্টটলীয় দর্শনে স্রষ্টার বর্ণনা দেওয়া হয় নেতিবাচক বা প্রত্যাখ্যানমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে। নির্দিষ্ট কোনো বৈশিষ্ট্য স্রষ্টার আছে, এমন ধারণাকে সত্যায়ন করা হয় না। বরং স্রষ্টার ব্যাপারে কোনো ধারণাকে নাকচ বা প্রত্যাখ্যান করা হয়। 'স্রষ্টা কী'—, সেটা বলা হয় না, বরং 'স্রষ্টা কী নন'—,তা বর্ণনা করা হয়। যেমন : স্রষ্টা সীমিত নন, স্রষ্টার মাঝে কোনো পরিবর্তন হয় না, স্রষ্টা সসীম নন ইত্যাদি। এই দর্শনে মনে করা হয়, মানবীয় ভাষা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা স্রষ্টার কোনো ধরনের ইতিবাচক বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। কোনো বৈশিষ্ট্য ইতিবাচকভাবে স্বীকার করা হলে এই গ্রীক দার্শনিকরা পরিপূর্ণতার যে ধারণা তৈরি করেছে, সেই 'পরিপূর্ণতা' নষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ স্রষ্টা তখন আর 'বিশুদ্ধ' ও 'পরিপূর্ণ' থাকবেন না। এই পদ্ধতিকে অনেক সময় 'ভিয়া নেগেটিভা' (ল্যাটিন) বা নেগেটিভ থিওলজি (নেতিবাচক ধর্মতত্ত্ব) বলা হয়। খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন ধারা অ্যারিস্টটলের এই চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত।

শাম (সিরীয়) অঞ্চলের খ্রিষ্টীয় ধর্মতাত্ত্বিককদের সূত্রে জাদ বিন দিরহাম (মৃ. ১০৫ হি./৭২৪ খ্রি.), জাহম বিন সাফওয়ান (মৃ. হিজরি ১২৮ হি./৭৪৫-৭৪৬ খ্রি.) এবং বিশর আল-মারিসির (মৃ. ২১৮ হি./৮৩৩ খ্রি.) মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর মধ্যেও এধরনের চিন্তা প্রবেশ করে এবং দর্শন ও কালামশাস্ত্রের সাথে যুক্ত বিভিন্ন ধারাকে প্রভাবিত করে, যার নেতিবাচক ফলাফল আজও বিদ্যমান। মুসলিম উম্মাহর ওপর গ্রীক দর্শনের এ প্রভাব নিয়ে এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে সাইয়্যিদ কুতুব আলোকপাত করেছেন। নিঃসন্দেহে ইসলামি আকীদা অ্যারিস্টটলের দর্শনের চেয়ে একেবারেই আলাদা, কুরআন ও হাদীসে মহান আল্লাহর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং কাজের কথা সুস্পষ্টভাবে এসেছে। এমন অনেক আয়াত এ বইতে উদ্ধৃত হয়েছে। (অনুবাদক)

[2] আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, হাকায়িকুল ইসলামি ওয়া আবাতীলু খুসূমিহি (حَقَائِقُ الْإِسْلَامِ وَأَبَاطِيْلُ خُصُوْمِهِ), ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠার আলোচনা অবলম্বনে।

[3] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৮।

[4] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৮।

[5] আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, হাকায়িকুল ইসলাম, ৪০-৪১ পৃষ্ঠার আলোচনা অবলম্বনে।

[6] প্রাগুক্ত।

[7] নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং আবূ বকর (রদিয়াল্লাহু আনহু)।

[8] এই বইয়ের 'ব্যাপকতা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।